রজনীকান্ত সেন

দেবাশিস ভৌমিক

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচিপত্র

- তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে... ১৩
- তোমারি সেবক করো হে আজি হতে আমারে... ১৯
- যেদিন প্রথম ধরেছে কলি... ২৩
- তীব্র কালকূট হয় শুদ্ধ রসায়ন... ২৯
- নমো নমো নমঃ জননী দেবি মম... ৩৫
- প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর ... ৪০
- আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে... ৪৫
- আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি... ৫২
- তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও... ৬০
- আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে করব নিবেদন... ৬৭
- জননীর দ্বারেআজি ঐ শুন গো শঙ্খ বাজে... ৭৪
- প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে... ৭৯
- আবার এরা ঘিরেছে মোর মন... ৮৭
- পাত্রখানা যায় যদি যাক ভেঙেচুরে... ৯৩

।। লেখকের নিবেদন ।।

রবীন্দ্রবলয়ের মধ্যে থেকে যাঁরা সেকালে সঙ্গীতচর্চা করতেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের গান দীর্ঘ জনপ্রিয়তার পথ খুঁজে নিতে সক্ষম হয়েছিল। অতুলপ্রসাদ কিংবা রজনীকান্ত সেনের ক্ষেত্রে সে জনপ্রিয়তার স্রোতকে কাল বেশিদূর এগিয়ে দিতে পারেনি। তার অন্যতম একটা বড়ো কারণ হল, দ্বিজেন্দ্রলালের বেশির ভাগ গান জনপ্রিয় হয়েছিল তাঁর লেখা ও অভিনীত নাটকের কল্যাণে। এই সব নাটক দীর্ঘদিন পরেও শৌখিন বাঙালির নাট্যচর্চায় প্রাসঙ্গিক থেকে গেছে। আর নাটকের হাত ধরে গানগুলিও পাড়ি দিয়েছে একটার পর একটা সময়ের চড়াই উৎরাই। কিন্তু রজনীকান্ত সেনের ক্ষেত্রে তা হয়ে ওঠে নি। যদিও রজনীকান্ত আদৌ কবি ছিলেন, নাকি গীতিকার, তা নিয়ে আজও গবেষক-পণ্ডিত মহলে তর্কের অবসান হয়নি। কিন্তু শৈশব থেকে শুরু করে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত নানা ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে একটি আত্মভোলা মানুষের যে জীবনদর্শন উঠে এসেছে তাঁর সৃজনতালিকার শরীর জুড়ে তা পাঠক ও শ্রোতাকে যে স্বতন্ত্র ভাবনায় জারিত করে তা এক নিজস্ব জীবন দর্শন। রজনীকান্ত সেনের এই জীবন দর্শন কখনও কবিতার ভাবকে আশ্রয় করে, কখনও বা গানের শৈলীতে ভর করে নেমে এসেছে সঙ্গীতমঞ্চের চৌমহলায়। শ্রোতা তার গান শুনে যেমন ভাবে বিভোর হয়েছেন, তেমনি তাঁর বানীনির্ভরতা শ্রোতার মনে কবি রজনীকান্ত সেনের জন্য এক নিজস্ব শ্রদ্ধার আসন তৈরি করে দিয়েছে। উকিলের সত্য মিথ্যা নিয়ে জীবনকে অর্থহীন মনে করেন যে রজনীকান্ত, তিনি তো সাধারণ নন। তিনি যোগী,

তিনি সাধক, তিনি দার্শনিকতায় প্রাজ্ঞ এক স্থিতধী সত্তা। ঐশী অনুভবের জারণ বারবার গানের সুর হয়ে বেরিয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। কিন্তু ক্যানসারের বিষাক্ত ক্ষতই একদিন তাঁর সেই কণ্ঠের ওপর চেপে বসেছে নির্মম আসুরিক শক্তি নিয়ে। লড়াই করেও কবি হেরে গেছেন কলকাতা মেডিকেল কলেজের কেবিনে শুয়ে, চোখের কোণে টলটল করে উঠেছে এক অকৃতি অধম কবির নয়নাশ্রু। রবীন্দ্র সান্নিধ্যের সুখস্মৃতি প্রলেপের মতো আবরিত করেছে তাঁর ক্ষতস্থানকে। পরম যন্ত্রণায় কাতর হয়েও আত্মতৃপ্তির বিলাসিতায় নত হয়েছেন ঈশ্বরের কাছে—আমি সকল কাজের পাই যে সময়, তোমারে ডাকিতে পাই নে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মশাইএর বাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে গান গাইবার পর থেকেই জীবনের কক্ষপথ বদলে গিয়েছিল এক গানপাগল মানুষের। মুদ্রাদোষের মতো গানের সুর তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিল আষ্টেপৃষ্ঠে। কিংবা বলা ভালো, ক্রমশ মানুষটি যেন ডুবে যাচ্ছিলেন কাব্যভাবনার এক নিস্তরঙ্গ সলিলে। যতই নিমজ্জিত হচ্ছেন ততই স্বচ্ছসলিলা সরোবরের তলদেশে প্রকাশমান হয়ে উঠছিল আধ্যাত্মিকবোধ ও উপলব্ধি। আর ফেরার কোনো পথ নেই। জীবনদর্শনের এক সুগভীর প্রত্যয় অর্জন করে নিতে সময় নিয়েছিলেন মাত্র পঁয়তাল্লিশটি বছর। স্বল্পায়ু এই মানুষটির জীবন ও কৃতি নিয়ে একটি সংহত আলেখ্য নির্মাণের চেষ্টা করেছি মাত্র এখানে। গ্রন্থতীর্থ এর পুরোধাপুরুষ শ্রী শঙ্করীভূষণ নায়কের অকপট প্রার্থনা এ গ্রন্থের অবয়াব সংস্থানে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মিনী চৈতালী ভৌমিক ও কন্যাদ্বয় মিত্রবিন্দা ও ঐশীপ্রমার কাছে। রজনীকান্তের গানগুলি হারমোনিয়ামে বাজিয়ে তাতে গলা মেলানোর ইচ্ছে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম, এ গ্রন্থে উল্লিখিত গানগুলি নতুন করে আবিষ্কার করতে পেরে ওরাও কম খুশি নয়। তাই কৃতজ্ঞতার

প্রসঙ্গ অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। বইটি সাধারণ পাঠকের কাছে ব্যক্তি রজনীকান্ত থেকে গীতিকার রজনীকান্ত এই হয়ে ওঠার যাত্রাপথকে যদি আলোকময় করে তুলতে পারে তবে তাঁদের প্রতি আমার আগাম কৃতজ্ঞতা জানিয়ে রাখি।

বইমেলা ২০১৬

দেবাশিস ভৌমিক
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কালিয়াগঞ্জ কলেজ, উত্তরদিনাজপুর

।। তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে ।।

মাথার ওপর সামিয়ানার মতো নীল আকাশের গায়ে সল্‌মা জরির ভাস্বর তারাগুলি দিশাহীন মানুষের আটপৌরে দাওয়ায় একদিন নামিয়ে দিয়ে গেল নীল ধ্রুবতারাটিকে। মাত্র পঁয়তাল্লিশটি বসন্ত সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলে এক কবি গান গেয়ে গেলেন বাঙালিজাতির মননলোকের গর্জন জলসাঘরে। সেই মেহফিলের দেওয়াল জুড়ে সুরের জলছবি। বাণীর মন্ত্রযাপন মগ্ন শ্রোতার চৈতন্যচেতনায়। নীল ধ্রুবতারার মায়াবি আলোয় মোহময়ী রাত্রির ঝাড়বাতিতে মর্মী আলোর আবেগময় স্পর্শনুভব। বুকের গভীরে ভাবনার নিকোনো উঠোনে গ্রাম্যবধূর আলপনায় আন্তরিক স্পর্শের মতো কেউ যেন এঁকে দিয়ে গেল রবীন্দ্র সমসাময়িক এক সুভদ্র কবির নাম—রজনীকান্ত। কবি রজনীকান্ত সেন। উল্লসিত সুনামের মোহে ছুটে চলা কবিকুলের পিছু ডাককে উদাসীন উপেক্ষায় যিনি অনায়াসে এড়িয়ে গেলেন, জীবনের নতুন কক্ষপথ নির্মাণের একান্ত বাসনায় তিনি রজনীকান্ত সেন। তাঁকে নিয়েই পথ চলা।

রবীন্দ্র বলয়ের মধ্যে থেকে সেইসময় যারা গান লেখবার বিলাসিতা দেখাতেন, সেই অর্থে রজনীকান্ত গীতিকার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাননি। কিন্তু গানের প্রতি টান বা ভালোবাসা বিষয়টা শৈশব থেকেই রজনীকান্তকে আনমনা করে রাখত দিনের বেশিরভাগ সময়। এ সব তথ্য উঠে এসেছে একাধিক খ্যাতিমান মানুষের স্মৃতিচারণা থেকে। অবশ্য সব কিছুরই একটা অতীত থাকে, একটা পুরোনো গল্প থাকে।

রজনীকান্ত সেনের পিতা গুরুপ্রসাদ সেন মশাই কাটোয়ার মুন্সেফ পদে চাকরি করতেন। কিন্তু নিয়মমাফিক চাকরির সময়টুকু ছাড়া সারাদিন মশগুল থাকতেন গানবাজনা নিয়ে। তখন তো অবিভক্ত বঙ্গদেশ। কাজেই একছুটে পাবনা থেকে কাটোয়া পৌঁছে যেতে এমন কিছু কাঠখড় পোড়াতে হত না। পদবী সেন হলেও এঁরা জাতিতে ছিলেন বৈদ্য। পাবনার সেন পরিবার সেইসময় খুব সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বলে সুপরিচিত ছিল বলে জানা যায়। গুরুপ্রসাদের এক অদ্ভুত নেশা ছিল ব্রজবুলি ভাষার অনুশীলনে। ভানুসিংহ নাম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পদাবলি লেখবার অনেক আগেই কিন্তু গুরুপ্রসাদ ব্রজবুলিতে 'অভয়া বিহার' নামে একটা গীতিকাব্য লিখেছিলেন। গীতিকাব্যের কনটেন্ট পুরাণ হলেও এর ভাষাটা ছিল ব্রজবুলি, এই তথ্য অনেকেরই অজানা। আর বিষয় বলতে গেলে পুরাণের গল্প থেকে ধার নেওয়া সতীর জন্ম থেকে শুরু করে দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ পর্যন্ত ঘটনা। গুরুপ্রসাদ এই দীর্ঘ ঘটনাক্রমে ছটা কাননে বর্ণনা করেছেন। অনালোকিত এই তথ্যটি জানা যাবে 'প্রবাসী' পত্রিকা শ্রাবণ ১৩১৮ তে প্রকাশিত জগদীশ্বর রায়ের লেখা 'একখানি অপ্রকাশিত কাব্য' শীর্ষক নিবন্ধে। গুরুপ্রসাদের লেখাটি কীর্তন আঙ্গিকে লেখা। শিরোণাম ছিল 'পদচিন্তা মণিমালা'।

রজনীকান্তের সঙ্গীতজ্ঞ হয়ে ওঠবার পেছনে এই কারণগুলো প্রায়শই ঢাকা পড়ে যায়। গুরুপ্রসাদ যে কেবল গীতিকাব্য লিখেই আত্মপ্রসাদের ষোলোআনা পূর্ণ করে নিয়েছিলেন, তা কিন্তু অর্ধসত্য। পূর্ণসত্যিটা হল কবিত্বগুণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে ক্রমশ ফুটে উঠেছিল এক গায়ক সত্তা। সুগায়ক হিসেবে গুরুপ্রসাদ সেনের খ্যাতি শুধু পাবনাতেই নয়, কাটোয়াতেও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাড়িতে যতটুকু সময় থাকতেন

মেতে থাকতেন গানবাজনা নিয়ে। রজনীকান্তের বড়ো হয়ে ওঠার দিনগুলিতে আকাশ জুড়ে এই সুরের মেলা পেখম তুলেছিল। তবে বাবার লেখা 'পদচিন্তা মণিমালা' যখন বেরিয়েছিল, সেই ১৮২৩ সালে রজনীকান্ত অবশ্য ভূমিষ্ঠই হন নি। কিন্তু বাবা বাড়িতে যখনই গান বাজনা নিয়ে বসতেন কোলের কাছে বসিয়ে রাখতেন আদরের রজনীকে। আর থাকত গুরুপ্রসাদের ভাইঝি অম্বুজা সুন্দরী। অম্বুজা আর রজনী একসঙ্গে বসে গান বাজনার পাঠ নিতেন গুরু প্রসাদের কাছ থেকে। রজনীকান্ত সেনের মা মনোমোহিনী দেবী নিজে গান গাইতে না জানলেও পরিবারের সঙ্গীত চর্চায় তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না, গোটা বাড়িতে সদা সর্বদা প্রবাহিত হত সুরের এক মূর্চ্ছনাময় প্রবাহ। মায়ের কাব্যচর্চার ঝোঁক আর পিতার সঙ্গীতিক প্যাশান্ রজনীকান্তের মনের মধ্যে ঘরবাধার কাজটি প্রায় শেষ করে আনছিল। রজনীকান্ত সেনের কথা পরে বলছি, তার আগেই বলে রাখি অত্যন্ত সুগায়িকা হিসেবে অম্বুজাসুন্দরী সেকালে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। ফলে একটা সহজ সিদ্ধান্তে আসা যেতেই পারে যে, রজনী এবং অম্বুজার ভবিষ্যৎ নির্মাণের কাটাছেঁড়া জীবনযাপনে সেন পরিবারের বিশিষ্ট পরিবেশ খুব বড়ো একটা ভূমিকা নিয়েছিল।

তাবলে গুরুপ্রসাদ স্বীয় পুত্রের পড়াশোনার দিকটি থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন এমনটা ভাবলে অন্যায় হবে। গানবাজনার পাশাপাশি ছোট্ট রজনী যাতে সময়োপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করবার জন্যই তিনি রজনীকে গ্রামের পাঠশালায় ভরতি করলেন না। তাছাড়া পরিবারের আভিজাত্যবোধ থেকেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচনের এই শুচিবায়ুগ্রস্থতা এসে থাকতে পারে। ১৮৬৫ সালের ২৬

জুলাই রজনীকান্তের জন্ম। বাংলা তারিখ অনুযায়ী দিনটি ছিল ১২৭২ বঙ্গাব্দের ১২ শ্রাবণ, বুধবার। রজনীকান্ত যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন পিতা গুরুপ্রসাদ পাবনার সিরাজগঞ্জে ছিলেন না। তবুও ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে সেদিন শাঁখআর উলুধ্বনিতে গোটা গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছিল। কাটোয়ার মুন্সেফ পিতার কাছে সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছেছিল কিনা জানা যায় না। তবে পরে পাবনায় ফিরে গুরুপ্রসাদের আহ্লাদ আর ধরে না। পুত্র কীভাবে সুস্থতার সঙ্গে বড়ো হয়ে উঠবে, কীভাবে তার পড়াশোনার জীবন শুরু করা হবে, এসব নিয়ে গুরুপ্রসাদই খুব চিন্তা করতেন। সেই মতোই ঠিক হয়েছিল যে, রজনী গাঁয়ের পাঠশালায় পড়বে না। তাকে ভরতি করার ব্যবস্থা হল রাজশাহীতে। কিন্তু সেখানে পড়তে গেলে রজনীর মতো একটা ছোট্ট ছেলে কোথায় থাকবে, কীভাবে থাকবে তা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিল। এই সমস্যার সুরাহা করে দিলেন গুরুপ্রসাদের দাদা গোবিন্দনাথ সেন। কারণ ছোট্ট রজনীকে রাজশাহীর স্কুলে ভরতি করার পরামর্শটাও তিনিই দিয়েছিলেন। কাজেই রজনীকে স্কুলে ভরতির যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিলেন গোবিন্দনাথই।

শুরু হল রজনীকান্ত সেনের বিদ্যালয় শিক্ষার প্রথম পর্ব। রাজশাহীতে থেকে পড়াশোনা করবার সব দায়িত্বই জ্যাঠামশাই হাতে। তিনি তখন রাজশাহীর খুব নামকরা উকিল। পশারও খুব ভালো ছিল। মজার কথা যার জন্য এত সব আয়োজন তার কিন্তু পড়াশোনায় তেমন মন নেই। পড়াশোনার প্রতি তেমন একটা আগ্রহ নেই রজনীর। কিন্তু অতিমাত্রায় মেধাবী ও প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন রজনীকান্ত। 'গ্রন্থকীট' বিশেষণটিকে কোনোদিন নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত কবতে চাননি তিনি। অথচ আশ্চর্যের কথা এই, শৈশবে প্রতিটি শ্রেণি পরীক্ষার আগে

রাতদিন জেগে রজনীকান্ত পড়া তৈরি করতেন। তখন পড়াশোনার প্রতি কোথা থেকে এত আগ্রহ তিনি পেতেন কে জানে। পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা যেত তাঁর দুচারদিনেরকৃচ্ছ্রতাই তাঁকে অনায়াস সাফল্য এনে দিত বারবার। এই তথ্যটি জানা যায়, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের লেখা একটি পুরোনো বই থেকে। বইটির নাম 'কান্তকবি রজনীকান্ত'। এই বইতে এক জায়গায় রজনীকান্তের একটি স্মৃতিচারণা লেখা রয়েছে—"দাবা, হারমোনিয়াম, তাস, ফুটবল—এই নিয়ে কাটিয়েছি যে বার বি. এ. পাশ হলাম, সেবার বাটিতে বসে কেবল হিন্দু হোস্টেলেরই ৮০/৮২ খানা পোস্টকার্ড পাই—যে এমন পাস।.....আমি যদি পড়তাম, তবে আমি স্পর্দ্ধা করে বলতে পারি যে, কেউ আমার সঙ্গে Compete করতে পারত না। আমি গান গেয়ে হেসে নেচে পাশ হয়েছি I was never a book-worm, for I was blessed with very brillianrt parts . রজনীকান্তের বিদ্যালয় শিক্ষার বেশির ভাগটাই কেটেছে উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন ১৮৮৩ সালে। ফল যে ভালো হয়েছিল তা বলা যাবে না। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া রজনীকান্তের বয়স তখন সতেরো।

রজনীকান্ত সেন এবার উচ্চশিক্ষার কারণে কোচবিহার থেকে চলে আসেন রাজশাহীতে। এখানেই ভরতি হলেন এফ এ পড়বার জন্য। ১৮৮৫ তে এফ এ পরীক্ষার ফল বেরোবার পর দেখা গেল ফল বেশ ভালোই হয়েছে। দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ উত্তীর্ণ হলেন রজনীকান্ত। তখন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়াটা আজকালকার মতো ছেলেখেলা বিষয় ছিল না। এরপর রজনীকান্ত সিটি কলেজ থেকে পথমে বি এ ও তার পর বি এল পাস করলেন। এ দুটি ফলাফলও আগের মতো বেশ ভালো